জলবায়ুর শব্দাবলী

জলবায়ু শিক্ষা হোক সবার জন্য

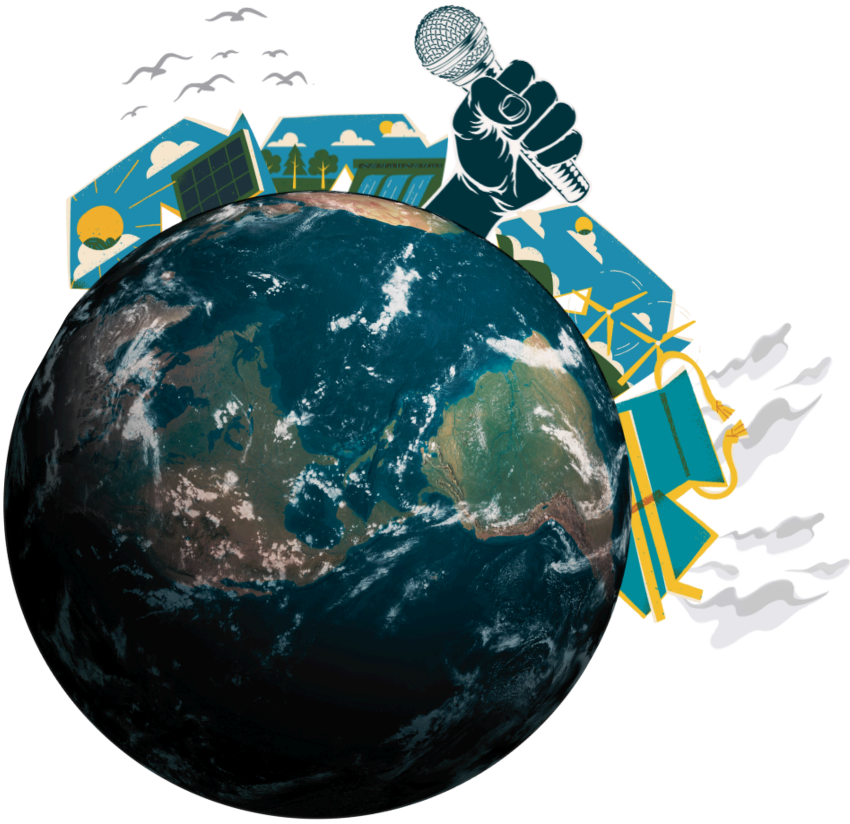

উদ্যোগে এবং বাস্তবায়নে

গ্রীনম্যান

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০২৫ / আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রকাশনায়

কিরণ প্রকটন (গ্রীনম্যানের একটি উদ্যোগ)

সহায়তায়

সুইডেন দূতাবাস, ঢাকা

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

কর্মসূচি পরিচালক

মোঃ আল ইমরান খান রাব্বী

কর্মসূচি সহযোগী

রিফা তাসফিয়া

ইবতিদা ইকবাল ইস্তু

কর্মসূচি ব্যবস্থাপক

ফারহান সাফকাত মোল্লা

ভিডিও বই নির্মাতা

সাইয়িদ ওমর আল ফয়সাল

ওয়েবপেজ নির্মাণে

ফয়সাল মোল্লা

অডিও বই-এর কণ্ঠে

রেজা এ. রহমান

প্রসঙ্গ কথা

“জলবায়ুর শব্দাবলি” বাংলা ভাষায় প্রথম অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু শিক্ষার একটি উদ্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত। এই প্রেক্ষাপটে, উদ্যোগটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক জটিল ধারণাগুলোকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রকল্পের উপকরণগুলো ডিজিটাল ও মুদ্রিত, উভয় মাধ্যমেই সকলের জন্য উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত, যাতে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী, যেমন- দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শ্রবণপ্রতিবন্ধী এবং বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সহজে জলবায়ু সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে ও বুঝতে পারেন।

এই উদ্যোগটি প্রান্তিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকেও সচেতন ও কার্যকর জলবায়ু পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

"ICCCAD Innovation Fund 2025"-এর 'Incubate Climate-resilient Ideas' বিভাগে বিজয়ী একটি উদ্যোগ

IUB greenman Sweden Sverige ICCCAD International Centre for Climate Change and Development

সূচীপত্র

অডিও বই টাইমস্ট্যাম্প এবং ভিডিও বই ডাউনলোড লিংক.................... 5
অ.................... **8**
অভিযোজন (Adaptation).................... 8
আ.................... **9**
আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন (Weather, Climate and Climate Change).................... 9
আরইডিডি+ (REDD+).................... 9
ই.................... **11**
ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট (Ecological Footprint).................... 11
ক.................... **12**
কপ (Conference of the Parties - COP).................... 12
কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint).................... 12
কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trading).................... 13
কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization).................... 13
কার্বন সিঙ্ক (Carbon Sink).................... 14
ক্লাইমেট ওভারশুট (Climate Overshoot).................... 15
ক্ষ.................... **16**
ক্ষয়ক্ষতি তহবিল (Loss and Damage Fund).................... 16
গ.................... **17**
গ্রীনওয়াশিং (Greenwashing).................... 17
গ্রীনহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect).................... 18
জ.................... **19**
জলবায়ু অভিবাসন (Climate Migration).................... 19
জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance).................... 19
জলবায়ু ন্যায়বিচার (Climate Justice).................... 20
জলবায়ু নিরাপত্তা (Climate Security).................... 21
জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 21
জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি (Climate-Smart Agriculture - CSA).................... 22
জলবায়ু সংকট (Climate Crisis).................... 22
জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা (Climate Resilience).................... 23
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan - NAP).................... 23
জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand - BOD).................... 24
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contribution - NDC).................... 25
ট.................... **26**
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal - SDG).................... 26

থ.. **27**

থ্রি আর (3R)..27

দ.. **28**

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction - DRR)..28

ন.. **29**

ন্যায্য রুপান্তর (Just Transitioning)..29

নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)...29

নেট শূন্য (Net Zero)... 30

প.. **31**

পরিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance).. 31

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)... 31

পুনরুৎপাদনশীল কৃষি (Regenerative agriculture)...31

প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement)... 32

প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধান (Nature based solutions)..32

প্রতিক্রিয়া চক্র (Feedback loop)...33

প্রশমন (Mitigation)...33

ব.. **35**

বায়ুমান সূচক (Air Quality Index - AQI)...35

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem).. 36

বিপদসীমা (Tipping point)... 36

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP)...37

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট - বিসিসিটি (Bangladesh Climate Change Trust - BCCT)....................38

বৃক্ষরোপণ ও পুনঃবনায়ন (Afforestation and Reforestation)... 38

বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy)..39

ম.. **40**

মরুকরণ (Desertification)...40

মহাসাগর অম্লায়ন / সমুদ্রের অম্লীকরণ (Ocean Acidification)... 40

ল.. **41**

লোকায়ত জ্ঞান (Indigenous Knowledge)..41

স.. **42**

সবুজ ও স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি (Green and Low-Carbon Economy).....................................42

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea level Rise)... 42

সূক্ষ্ম বস্তুকণা (Particulate Matter - PM)...43

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy).. 43

অডিও বই টাইমস্ট্যাম্প এবং ভিডিও বই ডাউনলোড লিংক

ক্র	বিষয়	টাইমস্ট্যাম্প	লিংক
১	প্রসঙ্গ কথা	০০:০০:০০	ডাউনলোড
২	অভিযোজন (Adaptation)	০০:০১:২১	ডাউনলোড
৩	আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন (Weather, Climate and Climate Change)	০০:০৩:১২	ডাউনলোড
৪	আরইডিডি+ (REDD+)	০০:০৪:৪৩	ডাউনলোড
৫	ইকোলোজিকাল ফুটপ্রিন্ট (Ecological Footprint)	০০:০৭:০০	ডাউনলোড
৬	কপ (Conference of the Parties - COP)	০০:০৯:৪৩	ডাউনলোড
৭	কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint)	০০:১২:২১	ডাউনলোড
৮	কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trading)	০০:১৪:৩৭	ডাউনলোড
৯	কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization)	০০:১৫:৫৮	ডাউনলোড
১০	কার্বন সিঙ্ক (Carbon Sink)	০০:১৭:২৪	ডাউনলোড
১১	ক্লাইমেট ওভারশ্যুট (Climate Overshoot)	০০:২০:০৭	ডাউনলোড
১২	ক্ষয়ক্ষতি তহবিল (Loss and Damage Fund)	০০:২২:১১	ডাউনলোড
১৩	গ্রিনওয়াশিং (Greenwashing)	০০:২৪:১২	ডাউনলোড
১৪	গ্রিনহাউজ প্রভাব (Greenhouse Effect)	০০:২৭:৫৪	ডাউনলোড
১৫	জলবায়ু অভিবাসন (Climate Migration)	০০:৩১:১৭	ডাউনলোড
১৬	জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance)	০০:৩৩:৪১	ডাউনলোড
১৭	জলবায়ু ন্যায়বিচার (Climate Justice)	০০:৩৬:২৩	ডাউনলোড
১৮	জলবায়ু নিরাপত্তা (Climate Security)	০০:৩৯:০১	ডাউনলোড
১৯	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)	০০:৪০:৫৯	ডাউনলোড
২০	জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি (Climate-Smart Agriculture- CSA)	০০:৪২:২১	ডাউনলোড
২১	জলবায়ু সংকট (Climate Crisis)	০০:৪৩:৪৪	ডাউনলোড

greenman Sweden Sverige ICCCAD International Centre for Climate Change and Development

২২	জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা (Climate Resilience)	০০:৪৪:৫১	ডাউনলোড
২৩	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan - NAP)	০০:৪৭:৩১	ডাউনলোড
২৪	জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand - BOD)	০০:৪৯:৫৩	ডাউনলোড
২৫	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি)	০০:৫১:৩৫	ডাউনলোড
২৬	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal - SDG)	০০:৫৩:২৬	ডাউনলোড
২৬	থ্রি আর (3R)	০০:৫৪:৪৩	ডাউনলোড
২৮	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction - DRR)	০০:৫৬:১২	ডাউনলোড
২৯	ন্যায্য রুপান্তর (Just Transitioning)	০০:৫৮:৩০	ডাউনলোড
৩০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)	০১:০০:৪২	ডাউনলোড
৩১	নেট শূন্য (Net Zero)	০১:০২:১৭	ডাউনলোড
৩২	পরিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance)	০১:০৩:২৭	ডাউনলোড
৩৩	পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)	০১:০৪:৪৬	ডাউনলোড
৩৪	পুনঃউৎপাদনশীল কৃষি (Regenerative Agriculture)	০১:০৬:০৭	ডাউনলোড
৩৫	প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement)	০১:০৭:৩৭	ডাউনলোড
৩৬	প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধান (Nature Based Solutions)	০১:০৮:৫৭	ডাউনলোড
৩৭	প্রতিক্রিয়া চক্র (Feedback Loop)	০১:১০:৩৫	ডাউনলোড
৩৮	প্রশমন (Mitigation)	০১:১২:০৬	ডাউনলোড
৩৯	বায়ুমান সূচক (Air Quality Index - AQI)	০১:১৩:২৪	ডাউনলোড
৪০	বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)	০১:১৬:৫৪	ডাউনলোড
৪১	বিপদসীমা (Tipping Point)	০১:১৮:১৭	ডাউনলোড
৪২	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP)	০১:২০:২৬	ডাউনলোড

৪৩	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট - বিসিসিটি (Bangladesh Climate Change Trust - BCCT)	০১:২২:১৬	ডাউনলোড
৪৪	বৃক্ষরোপণ এবং পুনঃবনায়ন (Afforestation and Reforestation)	০১:২৩:৫৬	ডাউনলোড
৪৫	বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy)	০১:২৬:২৩	ডাউনলোড
৪৬	মরুকরণ (Desertification)	০১:২৮:৪৬	ডাউনলোড
৪৭	মহাসাগর অম্লায়ন/ সমুদ্রের অম্লীকরণ (Ocean Acidification)	০১:৩০:২২	ডাউনলোড
৪৮	লোকায়ত জ্ঞান (Indigenous Knowledge)	০১:৩২:০৭	ডাউনলোড
৪৯	সবুজ ও স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি (Green and Low-Carbon Economy)	০১:৩৫:০১	ডাউনলোড
৫০	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি (Sea Level Rise)	০১:৩৬:২৪	ডাউনলোড
৫১	সূক্ষ্ম বস্তুকণা (Particulate Matter - PM)	০১:৩৮:১৩	ডাউনলোড
৫২	সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)	০১:৪০:৩৫	ডাউনলোড

অ

অভিযোজন (Adaptation)

অভিযোজন (Adaptation) এর অর্থ হলো পরিবর্তিত পরিবেশ বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। জলবায়ু অভিযোজন বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ব্যবস্থা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে নিজেদের অভিযোজিত করে, যাতে জীবনযাত্রা অব্যাহত থাকে ও ক্ষতি কমানো যায়। এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেও গৃহীত হয়। চার্লস ডারউইনের "প্রাকৃতিক নির্বাচন" তত্ত্বের (১৮৫৯) পর এই ধারণাটি জনপ্রিয় হয়। ১৯৮০-এর দশক থেকে জলবায়ু অভিযোজন আন্তর্জাতিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UNFCCC), কোপেনহেগেন চুক্তি ও প্যারিস চুক্তিতে ব্যপকভাবে আলোচিত হয়।

জলবায়ু অভিযোজন (Climate Adaptation) বন্যা, খরা ইত্যাদির সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও টেকসই উন্নয়নে (Sustainable Development) অভিযোজন কৌশল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার একটি উপায়।

অভিযোজনের কিছু বাস্তব উদাহরণ হলো, কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ফসলের ধরনে পরিবর্তন আনা, বন্যার সময় উপযোগী ফসল বেছে নেওয়া অথবা খরার সময় পানি সংরক্ষণের নানা উপায় গ্রহণ করা। অপরদিকে, শহরাঞ্চলে অভিযোজনের প্রয়োজন হলে অবকাঠামোর উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা এবং বন্যার সময় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতি চালু করা হয়।

ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অভিযোজন টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আ

আবহাওয়া, জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তন (Weather, Climate and Climate Change)

আবহাওয়া বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর গতি ও দিক ইত্যাদির সাময়িক অবস্থা। এটি ঘণ্টা বা দিনের ব্যবধানে পরিবর্তিত হতে পারে।
উদাহরণ: আজ ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে এবং তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এটি একটি আবহাওয়ার বর্ণনা।

জলবায়ু হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী (সাধারণত ৩০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে) গড় আবহাওয়ার অবস্থা। এটি অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন উষ্ণমণ্ডলীয়, শীতলমণ্ডলীয়, মরুভূমি, সমুদ্র উপকূলীয় জলবায়ু ইত্যাদি।
উদাহরণ: বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে বোঝায় দীর্ঘমেয়াদে পৃথিবীর গড় জলবায়ুর পরিবর্তন। এটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে, তবে বর্তমানে মানবসৃষ্ট কার্যকলাপ যেমন শিল্পায়ন, বন উজাড়, এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এর মূল কারণ।

উদাহরণ:

- গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত তাপদাহের ঘটনা বৃদ্ধি।
- উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।
- অপ্রত্যাশিতভাবে অতিবৃষ্টি বা খরার ঘটনা বৃদ্ধি।

আরইডিডি+ (REDD+)

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) হলো বন উজাড় ও অবক্ষয় থেকে কার্বন নির্গমন হ্রাসের একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যা বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করে। এটি গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে বন সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেয়। REDD-এর "+" চিহ্নটি বন সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও কার্বন সংরক্ষণ সম্পর্কিত অতিরিক্ত উদ্যোগ নির্দেশ করে।

২০০৫ সালে কোপেনহেগেন ক্লাইমেট চুক্তিতে REDD ধারণাটি প্রথম আলোচিত হয় এবং ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়া বালিতে অনুষ্ঠিত UN Climate Conference-এ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। ২০১০ সালে মেক্সিকোর কাংকুন সম্মেলনে (COP16) REDD-এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একে **REDD+** নামে চিহ্নিত করা হয়। এটি মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এর

কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বন উজাড় রোধ, বনভূমির অবক্ষয় কমানো, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, কার্বন শোষণ বাড়াতে বনায়ন ও দখলকৃত বন পুনরুদ্ধার, এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা ও নীতিনির্ধারণ।

REDD+ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বন ধ্বংস রোধ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে, বাতাস থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড কমায়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা করে। তবে এর বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা ও REDD+ নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা, বন উজাড়ের প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে কার্যকর সমাধান প্রদান, এবং পর্যাপ্ত আন্তর্জাতিক তহবিল নিশ্চিত করা।

কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার মতো দেশগুলো REDD+ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা বন সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

ই

ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট (Ecological Footprint)

ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট (Ecological Footprint) হলো কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার পরিমাপের একটি পদ্ধতি, যা আমাদের জীবনযাত্রা প্রকৃতির উপর কতটা চাপ সৃষ্টি করছে তা বোঝায়। প্রতিদিন আমরা খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করি এবং বর্জ্য উৎপন্ন করি, যার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি ও জলভাগ প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনীয়তার মাত্রা পরিমাপ করাই ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের মূল উদ্দেশ্য। এর প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে, কৃষি জমি, আবাসন ও অবকাঠামোর জন্য জমি, কার্বন শোষণের জন্য বনভূমি, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

১৯৯০-এর দশকে পরিবেশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম রিস (William Rees) ও মাথিস ওয়্যাকনারগেল (Mathis Wackernagel) এই ধারণাটি প্রথম উপস্থাপন করেন এবং ১৯৯৬ সালে এর পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করেন। ২০০৩ সালে **Global Footprint Network** এটিকে পরিবেশগত বিশ্লেষণের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। বর্তমানে এটি টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত ভারসাম্য ও জলবায়ু পরিবর্তন নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আজকের বিশ্বে মানুষের সম্পদ ব্যবহারের হার প্রকৃতির পুনরুৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা প্রতি বছর পৃথিবীর ১.৭ গুণ সম্পদ ব্যবহার করছি, যা বন উজাড়, পানির ঘাটতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাই **ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট** কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, বন সংরক্ষণ, খাদ্য অপচয় হ্রাস, বর্জ্য কমানো, এবং টেকসই কৃষি ও শিল্পনীতি গ্রহণ করা জরুরি।

এর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো **পৃথিবীর জৈব ক্ষমতা (Biocapacity)**, যা নির্ধারণ করে পৃথিবী কতটা প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন ও পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বাংলাদেশের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট প্রতি ব্যক্তিতে ০.৭-০.৮ গ্লোবাল হেক্টর, যেখানে বিশ্বের গড় ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট প্রতি ব্যক্তিতে ২.৮ গ্লোবাল হেক্টর। একজন ব্যক্তি বা একটি শহরের খাদ্য গ্রহণ, গাড়ি চালানো, বিদ্যুৎ ব্যবহার ও অন্যান্য সেবার মাধ্যমে তাদের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট তৈরি হয়। যদি এটি বেশি হয়, তাহলে বোঝা যায় যে তারা অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে এবং পরিবেশের উপর বেশি চাপ সৃষ্টি করছে। তাই আমাদের সচেতনতা ও টেকসই জীবনযাত্রার মাধ্যমে এই চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

ক

কপ (Conference of the Parties - COP)

COP বা Conference of the Parties শব্দটি এসেছে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এর আওতায় গঠিত একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে। এখানে “Parties” বলতে বোঝায় UNFCCC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে – যারা জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নীতিনির্ধারণে অংশ নেয়।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত Earth Summit-এ জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিনে প্রথম জলবায়ু সম্মেলন (COP1) অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে COP সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এসব সম্মেলনে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে G77 ও Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর পক্ষ থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন সহায়তা এবং ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর কণ্ঠস্বর হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।

বিভিন্ন COP সম্মেলনের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রয়েছে। যেমন, ১৯৯৭ সালের COP3-এ গৃহীত Kyoto Protocol উন্নত দেশগুলোকে নির্গমন হ্রাসে বাধ্য করে। ২০০৯ সালের COP15-এ জলবায়ু অর্থায়ন ও স্বেচ্ছা প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা হয়। ২০১৫ সালের COP21-এ স্বাক্ষরিত Paris Agreement-এ বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং চালু হয় NDC (Nationally Determined Contributions)। ২০২১ সালের COP26-এ "coal phase down" বা কয়লা ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত এবং জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি দেখা যায়। সর্বশেষ, ২০২৩ সালের COP28-এ ফসিল ফুয়েল ধাপে ধাপে বন্ধ করার অঙ্গীকার এবং "Loss and Damage Fund" চালু করা হয়, যা জলবায়ুজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। COP-এর সিদ্ধান্ত আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এটি জলবায়ু ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট (Carbon Footprint)

কার্বন ফুটপ্রিন্ট বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, পণ্য বা কর্মকাণ্ডের ফলে নির্গত হওয়া গ্রীনহাউস গ্যাসের (GHG) পরিমাণ নির্ণয় করা, যা সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) সমতুল্য হিসেবে প্রকাশ করা হয়। মূলত এটি একটি পরিমাপক, যা নির্দেশ করে কোনো কার্যক্রম কতটুকু গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গত করছে এবং পরিবেশের ওপর কী প্রভাব ফেলছে। এটি দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক।

১৯৯০-এর দশকে জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার ফলে এই শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালে উইলিয়াম রিগেস ও ডেভিড পেনম্যান প্রথমবারের মতো কার্বন ফুটপ্রিন্টের ধারণা উপস্থাপন করেন, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও পরিবেশগত দায়িত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ২০০০-এর দশকে পরিবেশ বিজ্ঞান

ও বিভিন্ন অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়। ২০০৬ সালে "অ্যান ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ" নামে আল গোরের প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে এটি আরও পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট শব্দটি পরিবেশ বিজ্ঞান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, এবং ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যায়ে CO_2 নির্গমনের হিসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের জলবায়ু নীতি ও কৌশল নির্ধারণেও এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কার্বন ফুটপ্রিন্টের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যবহার, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক যানবাহন ও বিমান ভ্রমণ, খাদ্য উৎপাদন, এবং প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর কিছু কার্যকর উপায় হলো, জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার, গাছ লাগানো ও বন সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহার, টেকসই শক্তির (সৌর, বায়ু, জল) ব্যবহার বৃদ্ধি, স্থানীয় ও কম কার্বন-নির্গমনকারী খাদ্য গ্রহণ, কম গাড়ি চালানো এবং হাঁটা বা গণপরিবহন ব্যবহার করা।

কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trading)

কার্বন বাণিজ্য বা Carbon Trading গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাণিজ্য স্কিম হিসাবেও পরিচিত। কার্বন বাণিজ্য ধারণাটি প্রথম উঠে আসে ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলে। ২০০৫ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইমিশন ট্রেডিং স্কিম (EU ETS) চালু হয়, যা বিশ্বের প্রথম বড় কার্বন বাজার। এই ধরনের স্কিমে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন দেশ বা অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের অনুমতি বিনিময় করে, যা প্রায়ই কার্বন ক্রেডিট নামে পরিচিত।

কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে, বিভিন্ন দেশ বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের কার্বন নির্গমন সম্মত সীমার নিচে কমিয়ে ফেলে অবশিষ্ট নির্গমনের অংশটি ‘কার্বন ক্রেডিট’-এর মাধ্যমে তাদের কাছে বিক্রি করতে পারে, যারা এখনও সেই সীমার বাইরে দূষণ করছে। তাত্ত্বিকভাবে, এটি নির্গমন কমিয়ে আনার জন্য এক ধরনের আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে।

কার্বন বাণিজ্যকে সাধারণভাবে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ব্যয় সীমিত করা যায়। এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় সেইসব খাতে, যেখানে কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য, যেমন: শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কলকারখানা ইত্যাদি।

কার্বন মুক্তকরণ (Decarbonization)

কার্বন মুক্তকরণ বা Decarbonization হলো জ্বালানি, শিল্প ও পরিবহন খাত থেকে কার্বন নির্গমন কমানোর প্রক্রিয়া। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করাই হলো কার্বন মুক্তকরণ। এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, বিশেষভাবে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য বিশ্বব্যাপী জলবায়ু নীতি এবং প্যারিস চুক্তি এর লক্ষ্যগুলির একটি অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কার্বন মুক্তকরণ শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় ২০ শতকের শেষভাগে, যখন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা কমানোর গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১৯৭০-এর দশক থেকেই নবায়নযোগ্য শক্তি ও জলবায়ু নীতিতে শব্দটির

ব্যপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে শব্দটি ব্যপকভাবে আলোচনায় আসে। বর্তমানে শব্দটির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় পরিবেশ নীতিতে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প খোঁজার জন্য এবং শিল্প ও প্রযুক্তিতে, কার্বন ক্যাপচার ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তিতে। এটি আরো ব্যবহৃত হয় জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন কমানো এবং বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি আলোচনায়।

কার্বন সিঙ্ক (Carbon Sink)

কার্বন সিঙ্ক হলো এমন একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ব্যবস্থা, যা বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) শোষণ করে এবং সংরক্ষণ করে। এটি মূলত এমন পরিবেশ বোঝায় যেখানে CO_2 শোষিত ও সংরক্ষিত হয়, ফলে পরিবেশে অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পায়। সাধারণত বন, মহাসাগর ও মাটির স্তর প্রাকৃতিক কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে।

কার্বন সিঙ্কের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে বন ও উদ্ভিদরাজি, যা CO_2 গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন নির্গত করে। সমুদ্রও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সিঙ্ক, কারণ এটি বিপুল পরিমাণ CO_2 শোষণ করে এবং কার্বন সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। মাটির নিচের জীবাশ্ম জ্বালানি ও ভূমি, বিশেষ করে পিটল্যান্ড (*peatland*) ও আর্দ্রভূমি, প্রচুর পরিমাণে কার্বন সংরক্ষণ করতে সক্ষম। কৃত্রিম উপায়ে কার্বন সংরক্ষণের জন্য কার্বন ধারণ ও সঞ্চয় (Carbon Capture and Storage - CCS) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, যেখানে শিল্প-কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত CO_2 সংগ্রহ করে ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও, কার্বন জব্দকরণ (Carbon Sequestration) প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে কার্বন শোষণের হার বাড়ানো হয়।

কার্বন সিঙ্কের ধারণাটি প্রথম ১৯৭০-এর দশকে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে, যখন বিজ্ঞানীরা পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কার্বন শোষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ১৯৮০-এর দশকে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা শব্দটির বহুল ব্যবহার শুরু করেন। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এ এই শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল এবং ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে এটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে কার্বন সিঙ্ক শব্দটি প্রাকৃতিক কার্বন সিঙ্ক এবং কৃত্রিম কার্বন সিঙ্ক সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি পরিবেশ বিজ্ঞান, জলবায়ু গবেষণা, বন সংরক্ষণ প্রকল্প, জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্প, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ নীতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কার্বন সিঙ্ক সংরক্ষণ করা বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন সিঙ্কের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হলে বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়ন করা, সমুদ্রের রক্ষা করা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ক্লাইমেট ওভারশুট (Climate Overshoot)

ক্লাইমেট ওভারশুট (Climate Overshoot) হলো এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা নির্ধারিত সীমা (১.৫°C বা ২°C) অতিক্রম করে, যার ফলে তীব্র জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে। এই অবস্থা সাধারণত গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নির্গমনের কারণে সৃষ্টি হয়, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বন উজাড়, কৃষি ও শিল্প কারখানার অতিরিক্ত নির্গমনের ফলে ত্বরান্বিত হয়।

১৯৯০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণায় প্রথম "ক্লাইমেট ওভারশুট" ধারণাটি উঠে আসে। ২০০০ সালের পর থেকে বিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস দেন যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো না গেলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নির্ধারিত সীমার ওপরে চলে যেতে পারে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি এই সমস্যার সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫°C-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ২০১৮ সালের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) রিপোর্ট-এ "ক্লাইমেট ওভারশুট" বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

ক্লাইমেট ওভারশুটের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, যা উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত করতে পারে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষকে স্থানান্তরিত করে। এছাড়া, তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম আবহাওয়া পরিস্থিতির সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। খাদ্য ও পানির সংকট তীব্র হয়ে ওঠে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিপজ্জনক। জীববৈচিত্র্যও মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়, কারণ পরিবর্তিত জলবায়ুতে অনেক প্রজাতি টিকে থাকতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদে, এই ওভারশুট বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটকে আরও গভীর করে তুলতে পারে, যার প্রভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভয়াবহ হতে পারে।

ক্ষ

ক্ষয়ক্ষতি তহবিল (Loss and Damage Fund)

ক্ষয়ক্ষতি তহবিল (*Loss and Damage Fund*) হলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও অঞ্চলের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক তহবিল, যা তাদের পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এটি বিশেষত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য গঠিত হয়েছে, যাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তি নেই।

এই ধারণাটি প্রথম ১৯৯১ সালে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণ তহবিল প্রস্তাবনার মাধ্যমে আলোচনায় আসে। ২০১৩ সালে *COP19* - এ "ওয়ার-স ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ" (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরে ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২২ সালে *COP27*-এ আনুষ্ঠানিকভাবে তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ২০২৩ সালের *COP28*-এ এর কাঠামো ও অর্থায়ন চূড়ান্ত করা হয়।

ক্ষয়ক্ষতি তহবিল আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে। এর সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্যারিস চুক্তি, যা ২০১৫ সালে গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি; *COP* বা জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন, যেখানে *Loss and Damage Fund* নিয়ে আলোচনা হয়; জলবায়ু ন্যায়বিচার, যা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে; এবং *Net Zero*, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি হ্রাসের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ভারত, বাংলাদেশ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলো, যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের মুখোমুখি হয়, এই তহবিল থেকে সহায়তা পেতে পারে।

গ

গ্রীনওয়াশিং (Greenwashing)

গ্রীনওয়াশিং একটি প্রতারণামূলক পরিবেশবান্ধব প্রচারণা। গ্রীনওয়াশিং বলতে বোঝায় যখন কোনো প্রতিষ্ঠান মিথ্যা বা অতিরঞ্জিতভাবে নিজেদের পরিবেশবান্ধব বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তাদের কার্যক্রম পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হয়। এটি মূলত ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল, যেখানে পরিবেশবান্ধব ইমেজ তৈরি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

গ্রীনওয়াশিং শব্দটি ১৯৮০-এর দশকে প্রচলিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে পরিবেশবিদ জে ওয়েস্টারভেল্ড প্রথম এটি ব্যবহার করেন। ১৯৯০-এর দশকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর মিথ্যা পরিবেশবান্ধব দাবির কারণে এটি জনপ্রিয়তা পায়। ২০০০-এর দশকে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সচেতনতার বৃদ্ধির ফলে শব্দটি আরও প্রচলিত হয়ে ওঠে। এটি মূলত ব্যবহৃত হয় বিপণন, বিজ্ঞাপন, কর্পোরেট নীতি ও পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

গ্রীনওয়াশিং সাধারণত তিনটি খাতে দেখা যায়। প্রথমত, বিপণন ও বিজ্ঞাপনে, যেখানে কোনো পণ্যকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে প্রচার করা হয়, যদিও বাস্তবে তা ক্ষতিকর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্প ও উৎপাদনে, যেখানে প্রতিষ্ঠান নিজেদের টেকসই বলে দাবি করলেও তাদের কার্যক্রম পরিবেশ দূষণ করে। তৃতীয়ত, সরকার ও সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে, যখন তারা জলবায়ু পরিবর্তন রোধের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয় না।

এটি সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট কৌশল ব্যবহার করে পরিচালিত হয়। যেমন, ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে পরিবেশবান্ধব ইমেজ তৈরি করা হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য গোপন রাখা হয়। অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করে যেমন "Eco-friendly", "Green", "Sustainable" ইত্যাদি শব্দ প্রচার করা হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্র্যান্ডিং পরিবর্তন করে সবুজ উদ্যোগ দেখিয়ে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতার ভান করে। আবার কিছু কোম্পানি যাচাইযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই পরিবেশবান্ধব লোগো বা সনদ ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে।

গ্রীনওয়াশিং আমাদের পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে, প্রকৃত পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার গতিকে ধীর করে দেয়। তাই গ্রীনওয়াশিং চিনতে পারা এবং প্রতিরোধ করা খুবই জরুরি। এর জন্য আমাদের উচিত সচেতন গ্রাহক হওয়া, কোম্পানিগুলোর স্বচ্ছ নীতি দাবি করা এবং যেকোনো পরিবেশবান্ধব দাবি বা সনদ যাচাই করা।

কিছু বাস্তব উদাহরণ গ্রীনওয়াশিংকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারে। যেমন, একটি প্লাস্টিক কোম্পানি যদি বলে, "১০০% রিসাইকেলযোগ্য বোতল!", কিন্তু তারা নতুন প্লাস্টিক উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় এবং খুব কম রিসাইক্লিং করে, তাহলে এটি গ্রীনওয়াশিংয়ের উদাহরণ। একইভাবে, যদি কোনো তেল কোম্পানি বলে, "আমরা পরিবেশবান্ধব শক্তিতে বিনিয়োগ করছি!", অথচ তারা জীবাশ্ম জ্বালানিতে শতগুণ বেশি বিনিয়োগ করছে, তাহলে সেটিও গ্রীনওয়াশিং। আবার, কোনো ফ্যাশন ব্র্যান্ড যদি প্রচার করে, "আমাদের কাপড় পরিবেশবান্ধব!", কিন্তু তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পানি ও রাসায়নিক ব্যবহার হয়, তাহলে সেটিও গ্রীনওয়াশিংয়ের মধ্যে পড়ে।

সুতরাং, গ্রীনওয়াশিং একটি গুরুতর সমস্যা যা জলবায়ু সংকট মোকাবিলার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি প্রতিরোধের জন্য আমাদের আরও সচেতন হওয়া এবং প্রকৃত পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলোর প্রতি সমর্থন বাড়ানো প্রয়োজন।

গ্রীনহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect)

"Greenhouse" শব্দটি এসেছে কাচের তৈরি ঘর থেকে, যেখানে গাছের জন্য তাপমাত্রা ধরে রাখা হয়, আর "Effect" বলতে এর প্রভাব বোঝানো হয়। গ্রীনহাউস প্রভাব হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস জমে সূর্যের তাপ আটকে রাখা, যার ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের উপস্থিতি পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

গ্রীনহাউস প্রভাবের কারণে পৃথিবীতে একটি সহনীয় তাপমাত্রা বজায় থাকে, যা প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তবে মানবসৃষ্ট গ্রীনহাউস গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এর ফলে চরম আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী নানা পরিবেশগত সংকট দেখা দিচ্ছে।

গ্রীনহাউস প্রভাব নিয়ে গবেষণা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ১৮২৪ সালে বিজ্ঞানী জোসেফ ফুরিয়ার প্রথম এই ধারণাটি দেন। যদিও ১৮৩০ সালে এটি আরও বিশদভাবে অধ্যয়ন শুরু হয়, ২০ শতকের পর এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে জন টিন্ডাল পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাস (যেমন CO_2 ও H_2O বাষ্প) তাপ আটকে রাখতে পারে। ১৮৯৬ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী স্যাভান্তে আরেনিয়াস গাণিতিকভাবে দেখান যে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। ১৯৫০ সালের পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা বাড়তে থাকলে "Greenhouse Effect" শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

গ্রীনহাউস প্রভাব সাধারণত দুই ধরনের হয়। প্রথমত, প্রাকৃতিক গ্রীনহাউস প্রভাব (Natural Greenhouse Effect), যা পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখে এবং জীবজগৎ টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত গ্রীনহাউস প্রভাব (Enhanced Greenhouse Effect), যা মূলত মানবসৃষ্ট দূষণের ফলে ঘটে। অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

গ্রীনহাউস প্রভাবের কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিক হলো, এটি পৃথিবীকে জীবনোপযোগী তাপমাত্রায় রাখে এবং গাছপালা ও প্রাণিকুলের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। তবে মাত্রাতিরিক্ত হলে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যেমন - বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, চরম আবহাওয়া (হারিকেন, খরা, দাবদাহ ও অতিবৃষ্টি), সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (বরফ গলে উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হওয়া) এবং কৃষিতে বিরূপ প্রভাব (খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়া)।

গ্রীনহাউস প্রভাব আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভয়াবহ হুমকি। এজন্য আমাদের পরিবেশবান্ধব জীবনধারা অনুসরণ করতে হবে এবং টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

জ

জলবায়ু অভিবাসন (Climate Migration)

জলবায়ু অভিবাসন বলতে বোঝায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হওয়ার প্রক্রিয়া। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে অনেক মানুষ তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। যখন জীবিকা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে, তখন জলবায়ু অভিবাসন ঘটে, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকুলতা সৃষ্টি করে।

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) "জলবায়ু অভিবাসী" ধারণাটি তুলে ধরে। ১৯৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা শুরু করে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অভিবাসন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে জাতিসংঘ ও আইপিসিসি (IPCC) এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করছে।

জলবায়ু অভিবাসনের মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খাদ্য ও পানির সংকট, জীবিকা হারানো এবং চরম আবহাওয়া। এটি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন অস্থায়ী অভিবাসন (দুর্যোগের পর সাময়িক স্থানান্তর), স্থায়ী অভিবাসন (বসবাসের স্থায়ী পরিবর্তন), অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (দেশের ভেতর স্থানান্তর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন (দেশান্তর)।

জলবায়ু অভিবাসনের ফলে নতুন স্থানে বসতি গড়া কঠিন হয়ে পড়ে, স্থানীয়দের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, কর্মসংস্থান সংকট দেখা দেয় এবং শহরে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীরা পরিচয় সংকটে পড়ে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি বাড়ায়।

এটি মোকাবিলায় দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো তৈরি, কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ, জলবায়ু অভিবাসীদের আইনি স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা জরুরি। বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ জলবায়ুর প্রভাবে ঢাকার বস্তিতে চলে যাচ্ছে, আফ্রিকায় দীর্ঘ খরার কারণে কৃষিজীবী পরিবার শহরে আশ্রয় নিচ্ছে এবং টুভালুর মতো দ্বীপ রাষ্ট্র সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছে। জলবায়ু অভিবাসন একটি বৈশ্বিক বাস্তবতা, যা দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য টেকসই নীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance)

জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance) হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে, কীভাবে ব্যবহৃত হবে এবং কোন দেশ বা সংস্থা তা দেবে, এসবই জলবায়ু অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত। উন্নত দেশগুলো অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী হওয়ায়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশন (UNFCCC)-এর মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্ব আলোচনায় আসে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে (COP15) উন্নত দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির (Paris Agreement) মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্ব আরও বাড়ে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (Green Climate Fund) ও গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (Global Environment Facility) এর মতো তহবিল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে সহায়তা করে।

জলবায়ু অর্থায়নের তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কমানো (Mitigation), জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানো (Adaptation) এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অর্থসহায়তা (Loss and Damage Finance)। অর্থায়নের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক তহবিল, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহায়তা। বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক জলবায়ু প্রকল্পে অর্থায়ন করে, আর বিভিন্ন দেশ নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ করছে।

তবে জলবায়ু অর্থায়নে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। উন্নত দেশগুলো এখনও তাদের প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার সম্পূর্ণ পরিমাণে সরবরাহ করেনি, এবং অর্থ কোথায় ব্যবহার হচ্ছে তা নির্ধারণ করা কঠিন। অনেক উন্নয়নশীল দেশ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থায়ন পাচ্ছে না, এবং এখনো অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ করছে।

ভবিষ্যতে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য উন্নত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য "Loss and Damage Fund" বাস্তবায়ন করতে হবে। সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund) জলবায়ু অর্থায়নের একটি কার্যকর উদাহরণ, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু প্রকল্পে অর্থায়ন সরবরাহ করছে।

জলবায়ু ন্যায়বিচার (Climate Justice)

জলবায়ু ন্যায়বিচার (Climate Justice) হলো এমন একটি নীতি, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে টেকসই সমাধান খোঁজে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবার ওপর সমানভাবে পড়ে না; উন্নত দেশগুলো সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করলেও, দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা মানে এই বৈষম্য দূর করা এবং দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা।

১৯৯০-এর দশকে জলবায়ু ন্যায়বিচারের ধারণা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলন ও জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে। ১৯৯২ সালের রিও সম্মেলন, ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৯ সালের পরিবেশবাদীদের আন্দোলন এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির আলোচনায় এটি গুরুত্ব পায়। জলবায়ু নীতিমালা, আন্তর্জাতিক চুক্তি, মানবাধিকার ও পরিবেশনীতির সাথে এটি গভীরভাবে যুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি ও নিরাপত্তা সংকট তৈরি করছে, যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রতিরক্ষা নীতিতেও গুরুত্ব পাচ্ছে।

জলবায়ু ন্যায়বিচারের মূলনীতি হলো দায়িত্বশীলতা (Accountability), যেখানে উন্নত দেশ ও বড় কোম্পানিগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে; পরিবেশগত ন্যায়বিচার (Environmental Justice), যা সকল শ্রেণির

মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে; মানবাধিকার (Human Rights), যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার রক্ষা করা হয়; অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার (Economic Justice), যা দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করে; এবং প্রজন্মগত ন্যায়বিচার (Intergenerational Justice), যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রয়োজনীয় কারণ দরিদ্র দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জলবায়ু অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলো বেশি কার্বন নিঃসরণ করলেও ক্ষতিপূরণ দিতে অনীহা দেখাচ্ছে। এর সমাধান হিসেবে নির্গমন হ্রাস, জলবায়ু অর্থায়ন, শরণার্থীদের সুরক্ষা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা মানে কেবল পরিবেশ রক্ষা নয়, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলা।

জলবায়ু নিরাপত্তা (Climate Security)

জলবায়ু নিরাপত্তা বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সংকট মোকাবিলার জন্য গৃহীত নীতি ও কৌশলকে বোঝায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগ, খাদ্য সংকট ও পানির অভাব দেখা দিলে তা সংঘাত, দারিদ্র্য ও বাস্তুচ্যুতির কারণ হয়ে ওঠে। তাই জলবায়ু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে এই ঝুঁকিগুলোর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া।

জলবায়ু নিরাপত্তার ধারণাটি প্রথমদিকে সামরিক ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা সংলাপ থেকে এসেছে। ১৯৮০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ২০০৩ সালে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে জলবায়ু নিরাপত্তাকে বৈশ্বিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ২০০৭ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে স্বীকার করে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও উদ্বাস্তু সংকটের কারণ হয়ে উঠছে, ফলে বিভিন্ন দেশ সামরিক ও প্রতিরক্ষা কৌশলে একে গুরুত্ব দিচ্ছে।

জলবায়ু নিরাপত্তার প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা, যেখানে খরা ও বন্যার কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে খাদ্য সংকট তৈরি হয়; পানি নিরাপত্তা, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং দেশগুলোর মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে; আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে; বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, যেখানে পরিবেশগত পরিবর্তন খাদ্যশৃঙ্খল ব্যাহত করছে; এবং জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা, যেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকার মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)

IPCC এর অর্থ হলো Intergovernmental Panel on Climate Change, যা জাতিসংঘ ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization - WMO) যৌথভাবে গঠন করে। এর কাজ হলো জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা। এটি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশ্লেষণ

করে এবং বিশ্বনেতাদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করে। তারা নিজেরা গবেষণা করে না, বরং হাজার হাজার বিজ্ঞানীর গবেষণার ভিত্তিতে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন তৈরি করে। এখন পর্যন্ত ৬টি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন বা Assessment Report (AR6) প্রকাশিত হয়েছে।

IPCC গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে, জাতিসংঘের উদ্যোগে। এর মূল কাজগুলো হলো: বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা, সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ধারণ করা, ঝুঁকি ও অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেওয়া। IPCC-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই জলবায়ু সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক চুক্তি (যেমন প্যারিস চুক্তি) ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ২০০৭ সালে IPCC শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি (Climate-Smart Agriculture - CSA)

জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি বা Climate-Smart Agriculture - CSA শব্দটি এসেছে কৃষির টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ধারণা থেকে। CSA তিনটি লক্ষ্যকে একসাথে অর্জন করতে চায়: খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো।

২০১০ সালের দিকে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা Food and Agriculture Organization - FAO প্রথম CSA ধারণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব করে। এর ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ কৃষি ব্যবস্থাপনা, পানি সংরক্ষণ, উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন, সাশ্রয়ী চাষপদ্ধতি ইত্যাদি। এই ধারণা জানার ফলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষি উৎপাদন যেভাবে হুমকির মুখে ফেলছে , যেমন খরা, বন্যা, নতুন রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে কৃষিকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে উৎপাদন বজায় থাকে এবং পরিবেশের ক্ষতি না হয়। স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি যেমন ড্রিপ ইরিগেশন, সঠিক সার ব্যবহার, সহনশীল ফসলের জাত উন্নয়ন CSA-এর অংশ। জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষির ভূমিকা কমানো এবং কৃষকের জীবনমান রক্ষা করাই CSA-এর প্রধান লক্ষ্য।

জলবায়ু সংকট (Climate Crisis)

জলবায়ু সংকট বা Climate Crisis হলো এমন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যেখানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, বৈরি আবহাওয়া এবং জীববৈচিত্র্যের হুমকি বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ, বন উজাড় এবং জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন এতটাই তীব্র হয়েছে যে এটি মানবসভ্যতা ও প্রকৃতির জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে। ২০১৮ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সংস্থা (IPCC) এটিকে "জলবায়ু পরিবর্তন" বা Climate Change কে "একটি বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা" হিসেবে ঘোষণা করে।

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, ব্যপকভাবে গাছ লাগানো এবং টেকসই জীবনযাত্রার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এই সংকটের সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটের নেতিবাচক প্রভাব কমানো সম্ভব।

জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা (Climate Resilience)

জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা বলতে বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী টিকে থাকার সক্ষমতা। বন্যা, খরা, ঝড় ও তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগ ক্রমেই বাড়ছে, তাই আমাদের এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে আমরা এসব পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে নিতে পারি এবং দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারি। জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতাকে কোনো দেশ বা জনগণের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহ্য করা ও পুনরুদ্ধার করার সক্ষমতাকে বোঝায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তুলতে দুর্যোগ প্রস্তুতি, কৃষি কৌশল পরিবর্তন ও পানি ব্যবস্থাপনার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

১৯৭০-এর দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশনে (UNFCCC) এটি আলোচনায় আসে এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে এর গুরুত্ব আরও স্বীকৃতি পায়। জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল ও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি মূল্যায়ন, অভিযোজন পরিকল্পনা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা। এর মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করা। পরিবেশগত দিক থেকে উপকূলীয় বন সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। সামাজিক দিক থেকে দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, আর অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার।

এই ক্ষেত্রে কিছু বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন অর্থায়নের অভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং কার্বন নির্গমন হ্রাসে ধীরগতি। ভবিষ্যতে সবুজ অবকাঠামো তৈরি, জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করা ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশে উঁচু বাঁধ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততা মোকাবিলা করা যায়। একইভাবে, শহরগুলোতে পরিবেশবান্ধব স্থাপত্য তৈরি করা হচ্ছে, যা তাপপ্রবাহ কমাতে সহায়তা করবে।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan - NAP)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বা National Adaptation Plan (NAP) হলো জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এর অধীনে তৈরি একটি কৌশলগত কাঠামো, যা বিভিন্ন দেশকে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। ন্যাপ এর আওতায় বিভিন্ন দেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করতে সক্ষম করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও বাজেট কাঠামো একত্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২০১০ সালে ক্যানকুন অভিযোজন কাঠামো (Cancun Adaptation Framework)-এর অধীনে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের ১৬তম অধিবেশনে (COP-16) ন্যাপ শব্দটি চালু হয়। এর আগে, দেশগুলো ২০০১ সালে প্রবর্তিত জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (NAPA)-এর অধীনে স্বল্পমেয়াদি অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করত। NAPA

থেকে NAP-এ স্থানান্তরের উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী প্রকল্পের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি, নিয়মতান্ত্রিক ও টেকসই অভিযোজন পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের ন্যাপ (২০২৩-২০৫০)-এর মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু-সহনশীল জাতি গঠন করা, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায় ও সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে। প্যারিস চুক্তির মতো বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বাংলাদেশের ন্যাপ (২০২৩-২০৫০) জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার জন্য একটি কাঠামোগত রোডম্যাপ প্রদান করে, যা টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে ন্যাপ এর ৮টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো -

১. জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা

২. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও সামাজিক নিরাপত্তা

৩. কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন

৪. নগর উন্নয়ন

৫. বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

৬. নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা

৭. গবেষণা ও উদ্ভাবন

৮. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand - BOD)

জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD) হল পানির মান নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা নির্দিষ্ট সময় ও তাপমাত্রায় পানির নমুনায় থাকা জৈব পদার্থ পচাতে অণুজীব দ্বারা ব্যবহৃত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপ করে। এটি মূলত জৈব দূষণের মাত্রা বোঝায়। উচ্চ BOD মান মানে পানিতে বেশি জৈব দূষণ রয়েছে, যা জলজ জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ, কারণ এটি পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে। BOD শব্দটি ১৯১৪ সালে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নথিভুক্ত হয়।

BOD এর মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয় জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য নির্ণয়, বর্জ্য জল পরিশোধন ব্যবস্থা পর্যালোচনা, এবং জৈব দূষণের উৎস শনাক্তকরণের জন্য। BOD পরিমাপের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হল ৫ দিনব্যাপী BOD পরীক্ষা, যেখানে পানির নমুনার ইনকিউবেশনের আগে ও পরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়।

BOD বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে গার্হস্থ্য পয়ঃনিষ্কাশন, শিল্প বর্জ্য পদার্থ, কৃষি থেকে রাসায়নিক প্রবাহ, নগর বৃষ্টির পানি প্রবাহ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থের মতো প্রাকৃতিক উৎস। বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর BOD মাত্রা অত্যন্ত উচ্চ, যা মূলত শিল্প বর্জ্য ও অপরিশোধিত পয়ঃনিষ্কাশনের কারণে ঘটে। এটি পানির গুণমানের অবনতি ঘটায় ও জলজ জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (Nationally Determined Contribution - NDC)

NDC বা Nationally Determined Contribution একটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতিগত শব্দ, যা জাতিসংঘের "প্যারিস চুক্তি" (Paris Agreement), ২০১৫ অনুযায়ী গৃহীত হয়। NDC হলো প্রতিটি দেশের সেই পরিকল্পনা বা প্রতিশ্রুতি, যার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নিজেদের লক্ষ্য ও পদক্ষেপ ঘোষণা করে। এই অবদান প্রতিটি দেশ নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, সক্ষমতা ও জলবায়ু ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করে।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিস চুক্তি সই হওয়ার পর থেকে "NDC" শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। ২০১৬ সালে চুক্তি কার্যকর হলে, দেশগুলো প্রথমবার তাদের NDC জমা দেয়। বাংলাদেশ প্রথম NDC জমা দেয় ২০১৬ সালে এবং সর্বশেষ হালনাগাদ NDC জমা দেয় ২০২১ সালের আগস্টে। সেখানে ১৫% নিঃসরণ স্বেচ্ছায় কমানোর প্রতিশ্রুতি এবং ৬.৭৩% শর্তসাপেক্ষে আরও কমানোর লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্প ও কৃষি খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। NDC-র মূল লক্ষ্যসমূহ হলো- গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

NDC জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কারণ, এটি প্রতিটি দেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে, নির্গমন হ্রাস, অভিযোজন ও অর্থায়ন, এই তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে এবং এটি একটি "Bottom-Up Approach”, যেখানে প্রতিটি দেশ নিজে সিদ্ধান্ত নেয়।

ট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal - SDG)

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সুযোগ রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটায়। এটি অর্থনীতি, পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন নিশ্চিত করে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নির্ধারণ করে।
এসডিজির মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা, পরিচ্ছন্ন পানি ও স্যানিটেশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প ও উদ্ভাবন, বৈষম্য হ্রাস, টেকসই শহর, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শান্তি ও ন্যায়বিচার এবং অংশীদারিত্ব রয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। এটি আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও টেকসই ও উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

থ

থ্রি আর (3R)

থ্রি আর (3R) হলো পরিবেশ সংরক্ষণের তিনটি মূলনীতি, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এর তিনটি মূলনীতি হলো: **Reduce বা হ্রাস করা** যার অর্থ বর্জ্য উৎপাদন কমানো এবং প্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর মাত্রা হ্রাস করা, যেমন প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো। **Reuse বা পুনঃব্যবহার করা** এর অর্থ একবার ব্যবহৃত পণ্য পুনরায় ব্যবহার করা, যেমন পুরানো প্যাকেজিং বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার। **Recycle বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা** এর অর্থ বর্জ্যকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপাদানে পরিণত করা, যেমন কাগজ, কাচ, এবং প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা।

থ্রি আর (3R) ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈশ্বিক পরিবেশ আন্দোলনের অংশ হিসেবে জনপ্রিয় হয় এবং বর্তমানে এটি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্লাস্টিক দূষণের প্রেক্ষাপটে আরও গুরুত্ব পেয়েছে। এই ধারণার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষণ কমাতে, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে, এবং শক্তি সাশ্রয় করতে পারি। এটি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG-12: Responsible Consumption and Production) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। থ্রি আর বাস্তবায়নে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য ব্যবহার করা, এবং বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে সচেতন হওয়া জরুরি।

দ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction - DRR)

"Disaster" (দুর্যোগ) শব্দটি ল্যাটিন "disastro" থেকে এসেছে, যার অর্থ অপ্রীতিকর বা বিপর্যয়কর ঘটনা; "Risk" (ঝুঁকি) শব্দটি ইতালীয় "risco" থেকে এসেছে, যার অর্থ অনিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা এবং "Reduction" (হ্রাস) শব্দটি ল্যাটিন "reducere" থেকে এসেছে, যার অর্থ কমিয়ে আনা বা নিয়ন্ত্রণ করা। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disaster Risk Reduction - DRR) হল একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো হয় এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা হয়।

Disaster Risk Reduction - DRR বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এর কার্যক্রম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে কাজ করে। DRR দুর্যোগের প্রভাব কমাতে যে কার্যক্রমগুলো করা হয়, তা অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন- অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে দুর্যোগের ক্ষতি সীমিত থাকে এবং মানুষের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতি কমানো, পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সহজতর করা।

১৯৯০-এর দশকে জাতিসংঘ দুর্যোগ প্রশমন কার্যক্রম (UNISDR) চালু করে, যা DRR ধারণার ভিত্তি তৈরি করে। ২০০৫ সালে স্যান্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক গৃহীত হওয়ার পর DRR একটি বৈশ্বিক কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। DRR ধারণাটি মূলত জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি (UNDRR) এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা দ্বারা প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে DRR-এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। DRR সাধারণত বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নাগরিক নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়।

DRR-এর মূল স্তম্ভগুলো হলোঃ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, সচেতনতা ও শিক্ষা, সংকট মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহনশীলতা (Resilience) তৈরি।

ন

ন্যায্য রূপান্তর (Just Transitioning)

ন্যায্য রূপান্তর ধারণাটি সর্বপ্রথম ১৯৮০ - এর দশকে মার্কিন শ্রমিক আন্দোলনে জনপ্রিয় হয়। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আমেরিকান শ্রমিক নেতা টনি মাজোচ্চি (Tony Mazocchi), যিনি তেল, রাসায়নিক এবং পারমাণবিক শ্রমিক ইউনিয়ন (Oil, Chemical and Atomic Workers International Union - OCAW) এ কাজ করতেন। Just Transitioning বা ন্যায্য রূপান্তর হলো এমন একটি কাঠামো, যার মূল লক্ষ্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে টেকসই, নিম্ন-কার্বন অর্থনীতির দিকে সুষ্ঠুভাবে স্থানান্তর নিশ্চিত করা। এই কাঠামো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি বিশেষত শ্রমিক, নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ও অর্থনীতিকে রক্ষা করার ওপর জোর দেয়, যারা সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের ফলে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারেন। বিশেষত, যেসব শ্রমিক ও অর্থনীতি কয়লা, তেল এবং গ্যাস শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

মাজোচ্চি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যেসব শ্রমিক ক্ষতিকর শিল্পে কাজ করেছেন, তাদের এককভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির বোঝা বহন করা উচিত নয়। বরং তাদের আর্থিক সহায়তা, চাকরির পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং সবুজ অর্থনীতির রূপান্তরের অংশ হিসেবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত। তার এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা শ্রমিক ইউনিয়ন, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং নীতিনির্ধারকদের জলবায়ু নীতির ভিত্তিতে শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়টিকে একীভূত করার ভিত্তি স্থাপন করে।

ন্যায্য রূপান্তরের অন্যতম লক্ষ্য হলো, নিম্ন-কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তরের ফলে যাতে সামাজিক বৈষম্য আরও না বাড়ে বা ব্যপক কর্মসংস্থান হ্রাস না ঘটে, তা নিশ্চিত করা। এটি শ্রমিক ও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে রক্ষা করা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, নীতিনির্ধারণ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

ন্যায্য রূপান্তর কাঠামোটি এখন আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতিতে ব্যপকভাবে স্বীকৃত, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ (UN) এবং প্যারিস চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চুক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)

নবায়নযোগ্য জ্বালানি হলো এমন শক্তি, যা প্রাকৃতিকভাবে পুনরায় উৎপাদিত হয় এবং কখনো ফুরিয়ে যায় না। এটি পরিবেশবান্ধব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ১৯৭০-এর দশকে জ্বালানি সংকট এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির পর থেকে বাড়তে থাকে। ১৮৮০-এর দশকে প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে সোলার সেল আবিষ্কার নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের পথ আরও উন্মুক্ত করে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে গুরুত্ব বাড়ছে। এ জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলো হলো, এটি পরিবেশবান্ধব, দীর্ঘমেয়াদে সাশ্রয়ী, অক্ষয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক। একই সঙ্গে এটি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কারণ এতে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমে। তবে প্রাথমিক ব্যয় বেশি, শক্তি উৎপাদনে পরিবর্তনশীলতা এবং শক্তি সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বাংলাদেশেও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের ৪০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, রাঙামাটির বায়ুশক্তি প্রকল্প এবং বিভিন্ন সোলার পার্ক নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তি এবং কার্যকর নীতিমালার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে।

নেট শূন্য (Net Zero)

নেট জিরো বা নেট শূন্য শব্দটি এসেছে "নেট কার্বন নিউট্রালিটি" থেকে, যার অর্থ নেট কার্বন নিরপেক্ষতা। নেট শূন্য হলো গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ এবং তা অপসারণের ভারসাম্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বজায় রাখা।

বিভিন্ন কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ার কারণে, বিশেষত কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের ফলে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য ২০০০ সালের শেষের দিকে নেট শূন্য ধারণাটি জনপ্রিয়তা পায় এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আরও গুরুত্ব লাভ করে। এই চুক্তির আওতায় বিভিন্ন দেশ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে।

নেট জিরোর মূল লক্ষ্য হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং কার্বন অপসারণের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো অর্জন করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর জন্য একটি টেকসই ও বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

প

পরিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance)

পরিবেশগত ভারসাম্য হলো বাস্তুতন্ত্রের এমন একটি অবস্থা, যেখানে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ও তাদের আশপাশের পরিবেশের মধ্যে সুসমন্বিত মিথস্ক্রিয়া বজায় থাকে। এই মিথস্ক্রিয়া জীব ও জড় উপাদানের মধ্যে ঘটে, যা প্রকৃতিকে স্থিতিশীল রাখে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা যখন বাস্তুতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন "পরিবেশগত ভারসাম্য" শব্দটি ব্যপকভাবে প্রচলিত হয়।

প্রকৃতিতে এই ভারসাম্য একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেন উৎপন্ন করে, জৈব পদার্থ পচে মাটির জন্য প্রয়োজনীয় সার তৈরি করে। তবে বন উজাড়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত মানব হস্তক্ষেপের ফলে এই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি, খাদ্য শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া এবং পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই এই ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের বন সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, পুনঃবনায়ন এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতির এই সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করবে।

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা বাস্তু সংকটাপন্ন এলাকা হল কিছু সংরক্ষিত অঞ্চল, যেগুলো রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ, এবং এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এদেশে রয়েছে পাহাড়, নদী, হাওর, সমুদ্র এবং বন। তবে মানবসৃষ্ট নানা কার্যকলাপ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এসব এলাকার বাস্তুতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে পরিবেশ ও সম্পদ রক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-এর অধীনে কিছু এলাকাকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। যেসব এলাকার পরিবেশগত অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন ও আশঙ্কাজনক, সেগুলোর সুরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, সাময়িকভাবে মানব কার্যকলাপ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, এবং পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের জন্য সংরক্ষণমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলাদেশে ঘোষিত পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন, হাকালুকি হাওর। এসব এলাকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুনরুৎপাদনশীল কৃষি (Regenerative agriculture)

পুনরুৎপাদনশীল কৃষি এমন একটি চাষাবাদ পদ্ধতি, যা মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক উপকরণের উপর নির্ভরতা হ্রাসে গুরুত্ব দেয়। ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জৈব চাষের গবেষণাকে সমর্থন করা একটি অলাভজনক সংস্থা রোডেল ইনস্টিটিউট প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করে। এটি এমন একটি টেকসই কৃষি পদ্ধতি, যেখানে পরিবেশের ক্ষতি না করেই ভূমি ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে কৃষি জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক। এখানে কভার ক্রপিং, নো-টিল চাষ, কম্পোস্টিং, কৃষি বনায়ন এবং ঘূর্ণায়মান চারণ-এর মতো পুনরুৎপাদনশীল কৃষি পদ্ধতি, ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে; মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়; বন্যা ও খরার মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে; কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করে; গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমায়। এছাড়াও, পুনরুৎপাদনশীল কৃষি উৎপাদন খরচ কমায়, ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে, কৃষকদের টেকসই জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এ অবস্থায় পুনরুৎপাদনশীল কৃষিতে রূপান্তর দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে, প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ করতে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement)

প্যারিস চুক্তি হলো ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত COP21 সম্মেলনে গৃহীত একটি বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তি, যেখানে বিশ্বের ১৯৬টি দেশ স্বাক্ষর করে। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ নভেম্বর ২০১৬ সালে কার্যকর হয়। চুক্তিটির মূল লক্ষ্য হলো গ্রীনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২° সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ রাখা এবং সম্ভাব্যভাবে ১.৫° সেলসিয়াসের নিচে ধরে রাখা। এটি চরম আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ঘাটতির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর প্রভাব মোকাবিলায় দেশগুলোকে একত্রিত করে।

প্যারিস চুক্তির আওতায় প্রতিটি দেশ নিজস্ব জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, যাকে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC - Nationally Determined Contributions) বলা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পর্যালোচনা ও আপডেট করা হয়। এছাড়াও, উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অনুন্নত দেশগুলিকে অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে সহায়তা করে।
প্যারিস চুক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিশ্চিত করে এবং একটি টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

প্রকৃতি ভিত্তিক সমাধান (Nature based solutions)

প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান হলো এমন কৌশল, যা জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও বাস্তুতন্ত্রকে ব্যবহার করে। এই সমাধানগুলো প্রকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সমর্থিত, যার লক্ষ্য পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা। এটি মানুষের কল্যাণ ও জীববৈচিত্র্য উভয়ের জন্যই উপকারী। "প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান" ধারণাটি ২০০০ সালের গোড়ার দিকে আলোচিত হয়, যা পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর কার্যকর ব্যবহার প্রতিফলিত করে। এর কিছু উদাহরণ হলো:

- **উপকূলীয় সুরক্ষা:** উপকূলরেখার ক্ষয় রোধ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল তৈরির জন্য ম্যানগ্রোভ বন পুনরুদ্ধার।
- **শহরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ:** শহরে পার্ক ও সবুজ ছাদ তৈরি করা, যা বায়ুর মান উন্নত করে ও তাপমাত্রা কমায়।

- **কৃষিতে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ:** ফসলের সঙ্গে গাছের সমন্বয় (Agroforestry), যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে।

প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের মূল লক্ষ্য। প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই ও স্থিতিস্থাপক সমাজ গঠন করা সম্ভব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

প্রতিক্রিয়া চক্র (Feedback loop)

জলবায়ু প্রতিক্রিয়া চক্র হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, যখন গবেষকরা পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য নিয়ে গবেষণা করেন, তখন জলবায়ু বিজ্ঞানে "প্রতিক্রিয়া চক্র" শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নকে আরও খারাপ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ,

- **বরফ গলার প্রভাব:** বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, যা উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি বাড়ায়।
- **বন ধ্বংসের প্রভাব:** কম গাছপালা মানে কম CO_2 শোষণ, যা বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে এবং পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে।

অন্যদিকে **নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্র** জলবায়ু পরিবর্তনকে ধীর করতে সাহায্য করে, তবে এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ,

- **গাছপালার বৃদ্ধি:** গাছপালা যত বৃদ্ধি পায়, তত CO_2 শোষণের পরিমাণ বাড়ে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস করে।
- **সমুদ্রের ভূমিকা:** সমুদ্র CO_2 শোষণ করে, যা উষ্ণায়ন কমাতে সহায়তা করে। তবে, সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এটি CO_2 ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যা উল্টো জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করে।

বর্তমানে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চক্রগুলোর প্রভাব নেতিবাচক চক্রগুলোর তুলনায় বেশি, যা জলবায়ু সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে।

প্রশমন (Mitigation)

পরিবেশগত প্রশমন বলতে বোঝায় মানুষের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট প্রকৃতির ক্ষতি কমানো বা প্রতিকার করার জন্য গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপ। এই ধারণাটি ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যখন পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment - EIA) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বিশ্লেষণ করা শুরু করে। প্রশমনের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব কমানো এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা।

তবে, প্রশমন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। দুর্বল পরিকল্পনা এবং অর্থের অভাব অনেক পদক্ষেপ বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলতে পারে। কিছু পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োজন, যা সবসময় সহজলভ্য নয়। তাছাড়া, দুর্বল আইন ও নিয়মের অস্পষ্টতা কার্যকর প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য সরকার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, কঠোর আইন প্রয়োগ ও সামাজিক ঐক্যমত্য প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা পরিবেশগত প্রশমন নিশ্চিত করতে পারবো এবং পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে পারবো।

ব

বায়ুমান সূচক (Air Quality Index - AQI)

বায়ুমান সূচক (Air Quality Index-AQI) হলো একটি মান নির্দেশক, যা বাতাসের গুণমান এবং এর সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন বায়ু দূষণকারীর ঘনত্বকে একটি সহজ সংখ্যাসূচক স্কেলে রূপান্তর করে, যাতে মানুষ বায়ুদূষণের মাত্রা বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

AQI ছয়টি ভাগে বিভক্ত, প্রতিটি নির্দিষ্ট সূচক তার মান, রঙের কোড এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ নির্দেশ করে। AQI স্তর ও এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব একটি টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হলো:

AQI মান	স্তর (বর্ণনা)	স্বাস্থ্যগত প্রভাব
০ - ৫০	ভালো (Good)	বায়ুর মান ভালো। স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।
৫১ - ১০০	মাঝারি (Moderate)	সংবেদনশীল ব্যক্তিদের সামান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।
১০১ - ১৫০	সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy for Sensitive Groups)	শিশু, বৃদ্ধ ও শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
১৫১ - ২০০	অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy)	সকলের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে, তবে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য তা আরও বেশি ক্ষতিকর।
২০১ - ৩০০	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Very Unhealthy)	গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, তাই জনসাধারণকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
৩০১ - ৫০০	বিপজ্জনক (Hazardous)	জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে এবং সম্পূর্ণ জনসংখ্যা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নির্দিষ্ট গড় সময়ের মধ্যে দূষণকারীর ঘনত্বের ভিত্তিতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি দূষণকারীর ঘনত্বকে একটি মানসম্মত সূত্র ব্যবহার করে AQI স্কেলে রূপান্তর করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বায়ুদূষণের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দূষিত দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক দূষিত দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়, যেখানে PM2.5 এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশকৃত সীমার তুলনায় প্রায় ১৫ গুণ বেশি ছিল। ২০২৩ সালে ঢাকার বাসিন্দারা মাত্র ৮ দিন 'ভালো' মানের বায়ু উপভোগ করতে পেরেছিলেন, যা গত আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি। সে বছরের বার্ষিক গড় AQI ছিল ১৭১, যা 'অস্বাস্থ্যকর' শ্রেণিতে পড়ে এবং শ্বাসযন্ত্র ও হৃদরোগজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

উচ্চ মাত্রার বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এতে শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ফুসফুসের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

AQI একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যা জনসাধারণকে বায়ুদূষণের মাত্রা সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, শিল্প ও যানবাহনের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, সবুজায়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বায়ুর মান উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি ভয়াবহ হুমকি, তাই এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

বাস্তুতন্ত্র হলো একটি প্রাকৃতিক একক, যেখানে জীব ও অজীব (জৈব ও অজৈব উপাদান) একসাথে মিলে পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা গড়ে তোলে। জীব ও পরিবেশের এই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার বিষয়কে বলা হয় বাস্তুবিদ্যা (Ecology)।

১৯৩৫ সালে বাস্তুবিদ এ. জি. ট্যান্সলি (A. G. Tansley) প্রথম "Ecosystem" বা বাস্তুতন্ত্র শব্দটি প্রয়োগ করেন। তিনি এখানে eco শব্দটিকে 'পরিবেশ' বোঝাতে ব্যবহার করেন।

বাস্তুতন্ত্রের আকার ও জটিলতা ছোট পুকুর থেকে বিশাল বনভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন হতে পারে। এটি জৈব উপাদান (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) ও অজৈব উপাদান (বায়ু, জল, খনিজ) নিয়ে গঠিত। পুষ্টি চক্র ও শক্তি প্রবাহের মাধ্যমে এসব উপাদান একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তবে বন উজাড়, পরিবেশ দূষণ, নগরায়ণ ও অস্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতি বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির প্রধান কারণ। ফলে আবাসস্থল ধ্বংস, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হচ্ছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি, যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যায়।

বিপদসীমা (Tipping point)

বিপদসীমা বা টিপিং পয়েন্ট বলতে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা বোঝায়, যেখানে একটি ছোট পরিবর্তন কোনো ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন আনতে পারে। শব্দটি মূলত পদার্থবিদ্যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে এটি সেই বিন্দুকে নির্দেশ করে, যখন একটি বস্তু স্থিতিশীলতা হারায়। জলবায়ু বিজ্ঞানে, টিপিং পয়েন্ট সেই সীমারেখাকে বোঝায়, যা একবার অতিক্রম করলে, আকস্মিক এবং সম্ভাব্য অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বরফের চাদর গলে যাওয়া, সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন।

বর্তমানে, বেশ কয়েকটি বিপদসীমা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিনল্যান্ড ও পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার বরফের চাদর দ্রুত গলে যাচ্ছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের জন্য এই বৈশ্বিক বিপদসীমাগুলো মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে। গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের ১৭% ভূমি পানির নিচে চলে যেতে পারে এবং ৩০% কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা খাদ্য নিরাপত্তার

জন্য বড় সংকট সৃষ্টি করবে। এছাড়া, পরিবর্তিত বর্ষার ধরণ ফসলের ব্যর্থতা ডেকে আনতে পারে, যা দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে আরও তীব্র করবে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদসীমাগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তরাজ্যের "Advanced Research and Invention Agency (ARIA)" ৮১ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে, যা গ্রিনল্যান্ডের বরফস্তরের পতন এবং সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

জলবায়ু বিপদসীমা অতিক্রম করা ঠেকাতে এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিষ্কার জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে দ্রুত স্থানান্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ এখনই নেওয়া না হলে, ভবিষ্যতে এর ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP) দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রণীত প্রধান নীতিমালা হিসেবে কাজ করে। এটি প্রথমবার ২০০৯ সালে প্রণীত হয় এবং পরবর্তীতে ২০২২ সালে সংশোধন করা হয়। এই পরিকল্পনা ছয়টি মূল কৌশলগত ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেয়, যার মধ্যে পাঁচটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজনমূলক ব্যবস্থা এবং একটিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে প্রশমন কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

BCCSAP-কে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির জন্য একটি নীলনকশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা, দুর্যোগ আশ্রয় উন্নয়ন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা মাথায় রেখে, বাংলাদেশ সরকার BCCSAP-এর একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রণয়ন করেছে, যাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এর আওতায় BCCT লক্ষ লক্ষ গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে, পাশাপাশি কার্বন নির্গমন কমাতে উন্নত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। BCCSAP-এর এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট - বিসিসিটি (Bangladesh Climate Change Trust - BCCT)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (Bangladesh Climate Change Trust - BCCT) ২০১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP)-এ বর্ণিত কৌশলগত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা। BCCT অভিযোজন ও প্রশমন উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে এবং পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণাকে সমর্থন করে।

BCCT এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ৮০০টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গভীর নলকূপ স্থাপন, এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। BCCT লক্ষ লক্ষ গাছ রোপণের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে, পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উন্নত রান্নার চুলা বিতরণ করেছে, যা জ্বালানির অপচয় কমিয়ে এবং বায়ুদূষণ হ্রাসে সহায়তা করছে।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য BCCT সৌর গৃহ ব্যবস্থা বিতরণ ও সৌর মিনি-গ্রিড প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও, BCCT সৌর রোড ল্যাম্প স্থাপন, জল পরিশোধন প্রকল্প বাস্তবায়ন, এবং গৃহস্থালি ও সম্প্রদায় পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা করেছে। এসব উদ্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং দেশের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বৃক্ষরোপণ ও পুনঃবনায়ন (Afforestation and Reforestation)

বৃক্ষরোপণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গাছপালা রোপণ করে এমন অঞ্চলে বনায়ন সৃষ্টি করা হয়, যেখানে পূর্বে কোনও বনাঞ্চল ছিল না। এটি পরিবেশগত সংকট মোকাবিলায় একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ, মাটির ক্ষয় রোধ, বায়ু ও পানির গুণমান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যায়।

বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে, ২০০০ সাল থেকে বনভূমি ধ্বংসের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তবুও বনভূমি রক্ষার জন্য অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ এখনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে রয়েছে। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে বনভূমির ওপর ব্যপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তবে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন বনায়ন ও পুনঃবনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে। উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনায়ন প্রকল্প ও জলবায়ু-সহনশীল অংশগ্রহণমূলক বনায়ন উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। এসব প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বৃক্ষরোপণের হার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করা।

বন একটি নির্দিষ্ট এলাকার ফুসফুসস্বরূপ। এটি শুধু অক্সিজেন সরবরাহ করে না, পাশাপাশি কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ, পানি ধারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাণীর আবাসস্থল রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডের ফলে অনেক বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

যেসব এলাকায় একসময় বন ছিল, কিন্তু দাবানল, দুর্যোগ, জনবসতি স্থাপন বা অন্যান্য কারণে সেগুলো ধ্বংস হয়েছে, সেইসব স্থানে নতুন করে পরিকল্পিত বন সৃষ্টি করাকে পুনঃবনায়ন বলা হয়। সুন্দরবন প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে প্রচুর গাছ এবং বিপন্ন প্রাণী প্রজাতি হারাচ্ছে, অথচ এটি বাংলাদেশসহ আশপাশের অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

বনজ সম্পদ রক্ষায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পুনঃবনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy)

বৃত্তাকার অর্থনীতি হল বর্জ্য হ্রাস করে পুনঃব্যবহার, মেরামত এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদানে রূপান্তরের মাধ্যমে পণ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার একটি পদ্ধতি। এটি ঐতিহ্যবাহী রৈখিক অর্থনীতির বিপরীতে কাজ করে, যেখানে "টেক-মেক-থ্রো অ্যাওয়ে" (Take-Make-Throw Away) মডেল অনুসরণ করা হয়। বৃত্তাকার অর্থনীতি যতটা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী উপকরণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়।

এই ধারণাটি ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যখন মানুষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরও সচেতন হতে শুরু করে। পরবর্তীতে, এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী এই ধারণার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী পণ্য ডিজাইন করা, কেনার পরিবর্তে ভাড়া নেওয়া ও ভাগ করে ব্যবহার করার মতো নতুন ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো উন্নত করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

এই মডেলের অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি দূষণ কমিয়ে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং টেকসই জীবনযাত্রাকে উৎসাহিত করে। বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবসা ইতোমধ্যে বৃত্তাকার অর্থনীতির ধারণা গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ,

- RE-ZIP পুনঃব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিং সরবরাহ করে।
- Fairphone এমন স্মার্টফোন ডিজাইন করে, যা সহজেই মেরামত করা যায়।
- IKEA সম্পূর্ণ টেকসই আসবাবপত্র তৈরির দিকে কাজ করছে।
- Apeel এমন এক বিশেষ আবরণ তৈরি করেছে, যা খাবারকে দীর্ঘদিন তাজা রাখে।

বাংলাদেশে মেরামত, পুনঃব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যা বৃত্তাকার অর্থনীতির বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। দেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রচুর পরিমাণে টেক্সটাইল বর্জ্য উৎপন্ন করে, যা পুনর্ব্যবহার ও আপসাইক্লিং-এর সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে, সীমিত প্রযুক্তি, দুর্বল নীতি ও কম বিনিয়োগ এই অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পুনর্ব্যবহারে বিনিয়োগ বাড়ানো হলে বাংলাদেশ বর্জ্য হ্রাস, সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই ভবিষ্যতের পথে আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

ম

মরুকরণ (Desertification)

মরুকরণ হলো শুষ্ক, অর্ধ-শুষ্ক ও নিম্ন-আর্দ্রতাযুক্ত অঞ্চলে ভূমির অবক্ষয় প্রক্রিয়া, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব কার্যকলাপের কারণে ঘটে। এর ফলে উর্বর জমি মরুভূমিতে পরিণত হয় এবং ভূমির জৈবিক ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এটি কোনো প্রাকৃতিক মরুভূমি গঠনের প্রক্রিয়া নয়, বরং মানব কার্যকলাপ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট একটি সমস্যা।

বিশ্বজুড়ে মরুকরণের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। খরা এবং অস্থিতিশীল ভূমি ব্যবহারের কারণে উত্তর আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ১৯৬০ এর দশকে উল্লেখযোগ্য ভূমি অবক্ষয় ঘটেছে। মধ্য এশিয়ার আরাল সাগর মানবসৃষ্ট মরুকরণের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে নদীর প্রবাহ পরিবর্তন করায় আরালকুম মরুভূমি গঠিত হয়েছে। এশিয়ার গোবি মরুভূমিও দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, যা চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশকে শুষ্ক অঞ্চল হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা না হলেও, এটি দীর্ঘ শুষ্কতা এবং খরার সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে দেশের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলগুলো । বাংলাদেশের প্রায় ৪৩% ভূমি বিভিন্ন ধরণের অবক্ষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এর কারণগুলির মধ্যে রয়েছে খরা, ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা, জনসংখ্যার চাপ, বন উজাড়, অনুপযুক্ত কৃষি পদ্ধতি, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদীর তীর ভাঙন। পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, যা বরেন্দ্র অঞ্চল নামে পরিচিত সেখানে মরুকরণের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

মহাসাগর অম্লায়ন / সমুদ্রের অম্লীকরণ (Ocean Acidification)

মহাসাগর অম্লায়ন বা সমুদ্রের অম্লীকরণ হল পৃথিবীর মহাসাগরের pH লেভেলের ক্রমাগত হ্রাস, যা মূলত বায়ুমণ্ডল থেকে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) শোষণের কারণে ঘটে। শিল্প বিপ্লবের আগে, সমুদ্রের গড় pH ছিল ৮.২, তবে মানব কার্যকলাপের ফলে বর্তমানে এটি কমে ৮.১ হয়েছে। CO_2 সমুদ্রে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) তৈরি করে, যা পরে বাইকার্বোনেট ও হাইড্রোজেন আয়নে বিভক্ত হয়, এতে পানিতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণীদের খোলস ও কঙ্কাল তৈরিতে সমস্যা তৈরি হয়, বিশেষ করে ঝিনুক, সামুদ্রিক প্রবাল, সামুদ্রিক অর্চিন এবং প্লাঙ্কটনদের জন্য। প্রবাল প্রাচীরের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায় এবং ব্লিচিং, ক্ষয় ও ঝড়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সমুদ্রের অম্লীকরণ সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খলকে ব্যাহত করে এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু প্রাণী যেমন কাঁকড়া ও চিংড়ি নিজেদের এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে ঝিনুকের মৃত্যু ও দক্ষিণ মহাসাগরে টেরোপড শেলের বিলুপ্তি সমুদ্রের অম্লীকরণের প্রভাবের উদাহরণ।

বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরও এই প্রক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, যেখানে pH মাত্রা ৭.৫৮, যা বিশ্ব গড়ের চেয়ে কম। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আশেপাশে প্রবাল প্রজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মহাসাগর অম্লায়ন মোকাবেলার জন্য কার্বন নির্গমন হ্রাস, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, উপকূলীয় আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং CO_2 অপসারণের কৌশল অনুসন্ধান জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ল

লোকায়ত জ্ঞান (Indigenous Knowledge)

লোকায়ত জ্ঞান বা Indigenous Knowledge হলো পরিবেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদী মিথস্ক্রিয়ার ফলে নির্দিষ্ট সমাজ বা সম্প্রদায়ের দ্বারা বিকশিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দর্শনের সংকলিত রূপ। যদিও এই জ্ঞানের অনুশীলন বহু প্রাচীন, "লোকায়ত জ্ঞান" শব্দটি গবেষণার ক্ষেত্রে আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পরিবেশ সংরক্ষণ, চিকিৎসা, টেকসই কৃষি এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে এটিকে ক্রমবর্ধমানভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, যেমন লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও ঘূর্ণিঝড়, এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য লোকায়ত জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিকাল থেকে লোকায়ত জ্ঞানের চর্চা হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, বুরকিনা ফাসো ও নাইজারের কৃষকরা শুষ্ক এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জমি পুনর্বাসনের জন্য "জাই পিটস" নামক ঐতিহ্যবাহী জলসংগ্রহ কৌশল ব্যবহার করেন। তারা মাটিতে ছোট ছোট গর্ত খনন করে এবং জৈব পদার্থ দিয়ে ভরাট করেন, যা আর্দ্রতা ও পুষ্টি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুষ্ক অঞ্চলে ফসল উৎপাদন বাড়ায়।

"থ্রি সিস্টার্স ফার্মিং" আরেকটি উল্লেখযোগ্য লোকায়ত জ্ঞানের উদাহরণ। ইরোকোইস ও অন্যান্য আদিবাসী আমেরিকান উপজাতিরা এই কৃষি পদ্ধতি অনুশীলন করে, যেখানে ভুট্টা, বিন ও স্কোয়াশ একসাথে চাষ করা হয়। ভুট্টা বিনের জন্য আরোহন কাঠামো হিসেবে কাজ করে, বিন মাটিতে নাইট্রোজেন স্থির রাখে, এবং স্কোয়াশ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আগাছা প্রতিরোধ করে ও আর্দ্রতা সংরক্ষণে সহায়তা করে। এই পদ্ধতি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে কিছু লোকায়ত জ্ঞানের চর্চা বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। যেমন - উপকূলীয় কৃষকরা মাটির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশ্র ফসল ও উঁচু বীজতলা ব্যবহার করেন, সাতক্ষীরার গাবুরার মতো অঞ্চলে নিচু ছাদবিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী ঘর নির্মাণ করা হয়, যা ঘূর্ণিঝড় সহ্য করতে সাহায্য করে, পিরোজপুরের নাজিরপুর অঞ্চলের ভাসমান খামারগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বন্যার মধ্যেও কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। বাংলাদেশে ৫৪টিরও বেশি আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে, যাদের অনন্য ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের কৃষি অনুশীলনগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স

সবুজ ও স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি (Green and Low-Carbon Economy)

সবুজ অর্থনীতি হলো এমন অর্থনীতি, যেখানে পরিবেশ রক্ষা ও মানুষের কল্যাণের ওপর জোর দেওয়া হয়, দারিদ্র্য কমায়, এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি হলো এমন অর্থনীতি যা কম পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন করার কথা বলে, যেমন- শক্তি উৎপাদন, পরিবহন, শিল্প সবখানে কম কার্বন নির্গমন হয়।

Green Economy শব্দটি প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৯ সালে, লন্ডনের "Blueprint for a Green Economy" নামক এক রিপোর্টে। এই রিপোর্টটি ছিল পরিবেশবান্ধব উন্নয়ননীতি নিয়ে, যা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব তা দেখানো। Low-Carbon Economy শব্দটি পরে আরো বেশি গুরুত্ব পায়, বিশেষ করে যখন বিজ্ঞানীরা (১৯৯০-এর দশকে IPCC-এর মাধ্যমে) জানাতে শুরু করেন যে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো না গেলে বিশ্বে জলবায়ু সংকট সৃষ্টি হবে। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দার পরে টেকসই উন্নয়নের অংশ হিসেবে "Green Economy" ধারণা জনপ্রিয় হয়। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবুজ ও স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কমানো ও পরিবেশ টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠি হলো এই রূপান্তর।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea level Rise)

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বলতে বিশ্বের মহাসাগরের গড় উচ্চতার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা মূলত বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ঘটে। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে তাপীয় সম্প্রসারণ, যেখানে সমুদ্রের পানি উষ্ণ হওয়ার সাথে সাথে প্রসারিত হয়, এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রে মিশে যায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্বব্যাপী উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর জন্য অত্যন্ত গভীর এবং বিপর্যয়কর। এর ফলে নিম্নাঞ্চলীয় এলাকাগুলো বন্যা, ভূমিক্ষয় এবং স্বাদু পানির লবণাক্তকরণের সম্মুখীন হয়, যা কৃষিজমির ক্ষতি এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতির কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশের বিস্তৃত উপকূলরেখা এবং নিম্নভূমির ভূপ্রকৃতি দেশটিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। গত আড়াই দশকে বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা প্রায় ২৬ সেন্টিমিটার বেড়েছে, যা বছরে গড়ে ১১.৬ মিলিমিটার হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন হুমকির মুখে পড়েছে, কৃষি ও মিঠা পানির উৎস সংকটের মুখে পড়েছে, এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয়ভাবে, বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করতে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে এই অভিযোজন প্রচেষ্টাকে আরও কার্যকর করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তহবিল ও প্রযুক্তি সহযোগিতা অপরিহার্য।

সূক্ষ্ম বস্তুকণা (Particulate Matter - PM)

সূক্ষ্ম বস্তুকণা (PM) বলতে বাতাসে ভাসমান অত্যন্ত ক্ষুদ্র কঠিন ও তরল কণার জটিল মিশ্রণকে বোঝায়, যার মধ্যে ধুলো, কাঁচ, ধোঁয়া এবং তরল কণার মতো পদার্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই কণাগুলোর আকার বিভিন্ন হয়, যেমন PM10 হলো ১০ মাইক্রোমিটার বা তার কম ব্যাসের শ্বাস-প্রশ্বাসযোগ্য কণা এবং PM2.5 হলো ২.৫ মাইক্রোমিটার বা তার কম ব্যাসের সূক্ষ্ম কণা, যা আরও বেশি ক্ষতিকর। সূক্ষ্ম বস্তুকণা প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক উৎসের কণাগুলি সরাসরি যানবাহনের নিষ্কাশন, শিল্প প্রক্রিয়া, এবং দাবানলের মতো প্রাকৃতিক উৎস থেকে নির্গত হয়, আর গৌণ উৎসের কণাগুলি সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) গ্যাসের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে তৈরি হয়।

PM2.5 কণা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণ এটি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে, যা শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, হৃদরোগ এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধিসহ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। বিশ্বব্যাপী, ঘনবসতিপূর্ণ নগর অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বায়ুর গুণগত মান বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, যা জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যপক প্রভাব ফেলছে।

বায়ু দূষণ কমাতে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এর মধ্যে যানবাহনের ব্যবহার হ্রাস, শক্তি সংরক্ষণ, খোলা জায়গায় কিছু না পোড়ানো, বায়ু পরিশোধকের ব্যবহার এবং সঠিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মতো ব্যক্তিগত পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত। একইসঙ্গে, সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর নির্গমন মান প্রয়োগ, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্প নির্গমন নিয়ন্ত্রণ, টেকসই নগর পরিকল্পনা, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ এবং বায়ুর মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে সূক্ষ্ম বস্তুকণা দূষণ কমানো সম্ভব। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত প্রচারণা চালানোও অপরিহার্য। সম্মিলিতভাবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বায়ুর গুণমান উন্নত করা সম্ভব হবে, যা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সুনীল অর্থনীতি বলতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নত জীবিকা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে বোঝায়। ২০১২ সালের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (রিও+২০) এ এই ধারণাটি গুরুত্ব পায়, যেখানে টেকসই উন্নয়নের আলোচনায় সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবহার সংক্রান্ত দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। সুনীল অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে টেকসই মৎস্য ও জলজ পালন, সামুদ্রিক পরিবহন, নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক শক্তি, সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন এবং সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি। এসব খাতের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমুদ্র সম্পদ থেকে দীর্ঘমেয়াদী উপকার পাওয়া সম্ভব।

একটি টেকসই সুনীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে কার্যকর নীতি বাস্তবায়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। জাতিসংঘের টেকসই সুনীল অর্থনীতি উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সমুদ্র-ভিত্তিক অর্থনীতির টেকসই ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করছে।

বাংলাদেশ, সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পর, সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান, টেকসই ব্যবহার, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং অবৈধ মাছ ধরা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সুনীল অর্থনীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং সামুদ্রিক পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

স্ক্যান করুন

https://greenmanbd.org/jolobayur-shobdaboli/

Contact Greenman

+880 1715-372572
www.greenmanbd.org
info.greenmanbd@gmail.com
Greenman HQ, Tala, Satkhira, Bangladesh